খসড়া পানি আইন ও জনমানুষের পানির অধিকারঃ
নাগরিক অভিমত ও প্রস্তাবনা

এ.কে.এম. মাসুদ আলী
নির্বাহী পরিচালক, ইনসিডিন বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি পানি আইন প্রণয়নের লক্ষে কাজ করে চলেছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পানি আইনের একটি খসড়া সীমিত পরিসরে আলোচিতও হয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের উন্নয়নের অঙ্গীকার ও জননিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে পুরনো খসড়াটির সংশোধন ও পরিমার্জন প্রয়োজন। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারছি যে, পূর্বের খসড়াটিকেই জাতীয় সংসদে উত্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এই প্রবন্ধে গণঅধিকার, জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা তথা গণ-বান্ধব ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ও জল সম্পদ সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের লক্ষ্যে আমরা কিছু বিশ্লেষন ও প্রস্তাবনা তুলে ধরছি। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রস্তাবিত খসড়া পানি আইনকে ঘিরে জনমানুষের পানি-অধিকারের প্রসঙ্গকে নীতি আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা।

শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে, প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি বাজারমুখী রাষ্ট্রনীতি ও উন্নয়ন ভাবনার ধারাবাহিকতার প্রকাশ। আমরা এ কারণে আইন ও অধিকারের আলোচনার গভীরে প্রবেশের আগে, জাতীয় পানি নীতির একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করে নেব।

জাতীয় পানি নীতির হাত ধরে বাজার পক্ষপাত

বাংলাদেশে জলাধার সংক্রান্ত নীতি অনেক ক্ষেত্রে স্ববিরোধী। এক্ষেত্রে জাতীয় পানি নীতিও (১৯৯৯) যথাযথ দিক নির্দেশনা দেয় না। ঐতিহ্যবাহী মৎসজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানে কোন আইনি রক্ষা কবচ নেই। নীতিপত্রটি অভ্যন্তরীণ জল সম্পদ সম্পর্কে কোন নির্দেশনা দেয় না। এতে নেই ভূমি দস্যুদের হাত থেকে উন্মুক্ত জলাশয় সুরক্ষার ও ব্যক্তিগত মালিকানা বা লিজের আওতায় উন্মুক্ত জলাশয়ে চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণে কোন কার্যকর আইন। ক্ষমতাশালীদের হাতে জলাশয়ের লিজ চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে, জেলে সম্প্রদায়ের/আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যের যে বহি:প্রকাশ তা মোকাবেলা করবার কোন স্পষ্ট নীতি বা পূর্ণাঙ্গ আইন নেই।[১]

জাতীয় পানিনীতি (১৯৯৯) তার উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনায় স্পষ্টতই পানি বেসরকারিকরণের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে, যা প্রস্তাবিত খসড়া পানি আইনেও প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু জল ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি অংশীদারিত্ব জাতীয় পানি নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও এই একই নীতিপত্রে জনসাধারণের পানি অধিকার ও জল ব্যবস্থাপনায় নারীর অধিকতর অংশগ্রহণকেও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে, জাতীয় পানিনীতিতে দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত ও শিশুদের জন্য পানি-প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা বিধানের অঙ্গীকার করা হয়েছে ।

আমরা জানি, বাংলাদেশে দীঘি-পুকুর, হাওর, বাঁওর, বিল, নদ-নদী, খাল ও প্লাবন ভূমি মিলিয়ে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন ৪৩.৪৭ লক্ষ হেক্টর। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মধ্যে মুক্ত জলাশয় অর্থাৎ নদী, খাল-বিল, বাঁওরের আয়তন প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। সরকারি হিসাবে বাংলাদেশে জলমহালের সংখ্যা প্রায় ১০,১১৯ টি। ভৌত আকার, অবস্থান, বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট, ব্যাপ্তি এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে জলমহালকে ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (ক) পুকুর-দীঘি, (খ) বিল, (গ) বাঁওর, (ঘ) হাওর ও মরা নদী এবং (ঙ) প্রবহমান নদী। বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় এ সকল জলমহালের স্বত্বাধিকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী। তবে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর এ সকল জলমহালের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ১৯৮০ সালে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের উপকার হবে এমন উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা বেশি দিন টিকেনি। আবার জলমহাল ব্যবস্থাপনা চলে আসে ভূমি মন্ত্রণালয়ে। আবার প্রভাবশালীদের আধিপত্য বেড়ে যায় জলমহালগুলোর উপর।[২] এই প্রেক্ষাপটে জনমানুষের স্বার্থ সুরক্ষায় একটি আইনী কাঠামো অত্যন্ত জরুরী - জনমানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি ও সুরক্ষা প্রদান করবে। অথচ প্রস্তাবিত পানি আইনে অধিকার ও সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গসমূহ উপেক্ষিত হয়েছে।

অবশ্য বর্তমান নীতি ও প্রস্তাবিত আইন উভয়ই জল-সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করছে। নীতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সরকার সমতাপূর্ণ বণ্টন, কার্যকর উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জল ব্যবস্থাপনার অধিকার সংরক্ষণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রীয় এই সম্পদের উপর আইন ও নীতি কতটুকু জনমানুষের অধিকার সংরক্ষণ করছে? জাতীয় পানি নীতি অনুযায়ী পানি ব্যবস্থাপনায়, গণমানুয়ের বদলে বেসরকারি ও বাণিজ্যিক সংস্থার অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। তাদের দেখা হয়েছে বিনিয়োগের উৎস হিসেবে। এর আওতায় বলা হয়েছে যে, বেসরকারিখাত বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হাতে ভূগর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলের ব্যবস্থাপনা অধিকার তুলে দেয়া যেতে পারে, যেন জনগনের জন্য নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য সরবারহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। এই ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভূমিকা সামনে আনা হয়েছে। এর আওতায়, নীতিপত্রে বলা হয়েছে; ক) ক্রমান্বয়ে ৫০০০ হেক্টর পর্যন্ত সরকারি জল-প্রকল্প সমূহকে (পৌর প্রকল্প ব্যতীত) স্থানীয় ও সামাজিক সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়া হবে। খ) ক্রমান্বয়ে ৫০০০ হেক্টরের বেশি সরকারি জল-প্রকল্প সমূহকে (পৌর প্রকল্প ব্যতীত) বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়া হবে- এক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহ লীজ বা প্রতিযোগিতাপূর্ণ বীডের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা চুক্তি বা স্থানীয় সরকার ও সংস্থার সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা হবে। সেচের জন্য জাতীয় পানি নীতিতে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রেও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

---

[১] Report on the South Asian Workshop: Towards an Action Agenda- Access to Land, Water and Forest Resources of the Poor, Women and Indigenous Peoples; 2008

[2] ড. আবুল হোসেন; বাংলাদেশে জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা: একটি পর্যালোচনা ; এএলআরডি আয়োজিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য প্রস্তুতকৃত নিবন্ধ; ২২ ডিসেম্বর, ২০০৮

তবে জাতীয় পানিনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে উচ্চারণটি নীতিপত্রের সাথে বেসরকাফর তথা বাণিজ্যিক খাতের মিতালী ও অধিকারভিত্তিক জল ব্যবস্থাপনার সংঘাতের সূচনা করে তা হলো এই যে–নীতিপত্রে জলকে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য করে দাম বা মূল্য নির্ভর (বাজার) ব্যবস্থাপনার আওতায় জল সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর অনুষঙ্গ হিসেবে চলে এসেছে, তথাকথিত ব্যয়-উসুলের (cost recovery) প্রসঙ্গ। সাধারণভাবে লীজ বা অন্যান্য বাজার পদ্ধতিতে পরিচালনা ও পরিচর্যার (O&M) খরচ তুলে আনতে বেসরকারি খাতকে সঙ্গী রাখবার প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জল সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে সরকারের দায়িত্ব হিসেবে না দেখে, নীতিপত্রে এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের দলের কাঁধেই ব্যয় বহনের দায় চাপানো হয়েছে। অন্য কথায় পানিকে পণ্য হিসেবে সর্বত্র সরবরাহ ও সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এই নীতি কাঠামো দাতা গোষ্ঠী অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংক ও আই.এম.এফ- এর বেসরকারি খাত ও জন-স্বার্থের চেয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রাধান্য দেওয়ার নীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। উল্লেখ্য বিশ্ব ব্যাংক ও আই.এম.এফ –

1. **জল সম্পদের উপর বেসরকারি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা কায়েম করতে এক ধোঁয়াটে পথ বেছে নিয়ে তারা বিকেন্দ্রীকরণের নীতির আড়ালে আসলে বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণের চেষ্টায়রত। তারা দুর্বল স্থানীয় সরকারের দোহাই দিয়ে, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের প্রস্তাব সামনে নিয়ে আসছে।**
2. **জল-ব্যবহারকারীদের দল গঠন করে জল-প্রকল্পসমূহের ব্যয়-উসুল করবার আওতায় প্রকৃত প্রস্তাবে তারা জনমানুষের জল-অধিকারকে প্রতিস্থাপন করে বাজারের বা বাণিজ্যের অধিকারের নামে।**[৩]

এই দুই প্রক্রিয়াই জনমানুষের জলের উপর সার্বজনীন আধিকারকে খর্ব করে। উপরন্তু, উন্নয়নের নামে আর্সেনিক দুষণের কারণেও হ্রাস পেয়েছে মানুষের নিরাপদ পানি প্রাপ্তির অধিকার। এখানেও সমন্বয় ও সুরক্ষা নীতির অনুপস্থিতি বড় প্রতিবন্ধকতা।

পানির অপচয় রোধ তথা সংরক্ষণের কথা বলে, পানিকে বিনা-মূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ না করে একটি অবচয়যোগ্য সম্পদ বিবেচনায় উপযুক্ত মূল্য কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার কথা বলে - আসলে জাতীয় পানি নীতিতে জলের উপর জনমানুষের অবাধ ও সার্বজনীন অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। আর নীতি কাঠামোর বাজার পক্ষপাতের পথ ধরেই প্রস্তাবিত (খসড়া) পানি আইনের আওতায় জল-ব্যবস্থাপনায় বাজার ও বেসরকারি বাণিজ্যিক খাতের প্রাধান্যকে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

খসড়া পানি আইন

আইনে মোট এগারোটি অধ্যায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই এগারোটি অধ্যায়ে মোট ৮৬টি ধারা এবং তিনটি তফশিল সন্নিবেশিত। সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায়, ৩৯১৯৯ নাম্বার প্রকল্পের মাধ্যমে এই খসড়া আইনটি প্রণয়ন করেছে। খসড়ার শিরোনামে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা'হলো "একটি আইন, যাহা বাংলাদেশের পানি নীতিকে কার্যকর করবে, পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, ব্যবহার এবং সুরক্ষার জন্য"।

অধ্যায়-০১ প্রাথমিক বর্ণনা/ধারণা এবং সংজ্ঞা এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে
অধ্যায়-০২ পানি আইন সম্পর্কিত প্রশাসন ও প্রয়োগ বিষয়ক বিবরণ ও কার্যক্রম এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে
অধ্যায়-০৩ মালিকানা, পানি ব্যবহার ও অপব্যবহার এবং অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এ অধ্যায়ে
অধ্যায়-০৪ এতে আইনানুগ পানি ব্যবহারের বিদ্যমান ব্যবস্থাপনার বিধান সম্পর্কিত আলোচনা আছে
অধ্যায়-০৫ সাধারণ কর্তৃত্ব এবং পানি ব্যবহারের অনুমতি (লাইসেন্স) সম্পর্কিত আলোচনা
অধ্যায়-০৬ পানির নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বিষয়ক বিধান রয়েছে এ অধ্যায়ে
অধ্যায় -০৭ পানির রক্ষনাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে
অধ্যায় -০৮ এ অধ্যায়ে আর্থিক বিষয়ক বিধান যুক্ত করা হয়েছে
অধ্যায় -০৯ পানি ব্যবহারকারীদের সংঘ/সমিতি বিষয়ক বিধান এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত রয়েছে
অধ্যায় -১০ ভূমির উপর অধিকার এবং অধিগম্যতা বিষয়ক বিধান আছে আলোচ্য অধ্যায়ে
অধ্যায় -১১ সাধারণ বিধানাবলী এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত

উল্লেখিত ১১টি অধ্যায় ও পরে তিনটি তফশিল এ আইনে সন্নিবেশিত আছে। এর মধ্যে তফশিল-০১: অনুমোদিতভাবে পানি ব্যবহারের বিষয়ে উল্লেখ আছে এবং তফশীল -০২ এ, আইনের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব ও কার্যাবলী বিধৃত রয়েছে এবং তফশীল-০৩, এখানে পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং দায়িত্ব সর্ম্পকে বিধৃত হয়েছে, যা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান কোনো কোনো দায়িত্ব বা কাজ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারবেন।

[৩] Ali; AKM Masud; The water world at grassroots:Bangladesh & South Asia; INCIDIN Bangladesh, 2008

এরই মধ্যে এই খসড়া আইনের প্রতিটি অধ্যায় ও ধারাভিত্তিক বিশ্লেষণ নাগরিকদের পক্ষ থেকে নীতি নির্ধারকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন-

অধ্যায়/ধারা	দুর্বলতা[৪]
অধ্যায়-০৩	মালিকানা, পানি ব্যবহার/অপব্যবহার ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত: সরকারের ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে যে কোন সংস্থা বা কাঠামোর কথা বলা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ বিষয়টি অস্পষ্ট রেখে বিতর্কিত ও অবাঞ্ছিত কাউকে বা কোন প্রতিষ্ঠানকে এ দায়িত্ব দিলে তা জনগণের অধিকারের মূল চেতনার বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে বলে মনে করা হয়েছে। জনগণের জন্যে কল্যাণকর নয় এমন কোন উদ্যোগ/কাঠামোকে (বেসরকারিভাবে) এ ক্ষমতা প্রদান, জনগণের সাধারণ স্বার্থের ও তার কল্যাণের পরিপন্থি কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচিত হবে বলে অনেকে মনে করছে।
ধারা-১৭	পানি ব্যবহারের প্রচলিত খাতগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ভবিষ্যত পানি ব্যবহার বা পানি ব্যবহারের বহুমাত্রিকতার বিষয়টি মোটেও বিবেচনায় রাখা হয়নি। জনগণের পানি ব্যবহারের বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট খাত চিহ্নিত করে উন্মুক্ত পরিসরে তা উন্মুক্ত রাখা বাঞ্চনীয় বলেই সকলের অভিমত। এক্ষেত্রে জনগনের সার্বজনীন অধিকারসমূহের পাশাপাশি ব্যতিক্রম ও বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় নেয়া উচিত বলে নাগরিক সমাজ মনে করছেন।
ধারা -২০	প্রাকৃতিক পানি ব্যবহারের অধিকারের মাধ্যমে কার্যত: জনগণের প্রাকৃতিক পানি ব্যবহার এক ধরণের নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে যে সকল ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার প্রচলন রয়েছে, যেমন, স্নান ও ধোঁয়ামোছার মতো কাজগুলোকেই কেবলমাত্র এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক পানি ব্যবহারে জনগণের যে বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্র্য রয়েছে, তা এখানে অনেকটা অনুপস্থিত এবং ভবিষ্যত বৈচিত্র্যময় ব্যবহারকেও এখানে বিবেচনায় রাখা হয়নি। অন্যদিকে, পানিদূষণ ও উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পানির ধারাকে বাণিজ্যিক স্বার্থে আবদ্ধ করাকে আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে যথাযথভাবে বর্ণনাও করা হয়নি কোথাও। ফলে প্রাকৃতিক পানির উৎস, ধারা, প্রবাহ বিনষ্টের যে সাধারণ চর্চা বর্তমানে দেখা যায়, ভবিষ্যতে তা আরও বেড়ে যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে করছেন।

এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ধারার পরিধি নির্ধারণের ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রয়োগিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা খসড়া নীতির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে না গিয়ে জনমানুষের অধিকারের বিপরীতে জল সম্পদের উপর বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আইনী উদ্যোগের বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

খসড়া পানি আইন ও জনমানুষের অধিকারের প্রশ্ন

সাধারণভাবে প্রস্তাবিত আইনের যে বিষয়গুলো পুণ:বিবেচনা করা জরুরি-

- আইনে **"পানি ব্যবহার অধিকার"**-এর আওতায় পানি ব্যবস্থাপনায় বাজার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি জনমানুষের স্বার্থ বিরোধী।
- কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে পানি ব্যবহারে অবচয় ও অপ-ব্যবহারের কথা বলে; জরুরি অবস্থার দোহাই দিয়ে, জনগণের পানি ব্যবহারের সার্বজনীন অধিকারকে যে কোন সময় সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া যাবে বলে আইনে বিধান রাখা হয়েছে। এই বিধান, প্রাকৃতিক পানির উৎসের ওপর কৃষক ও প্রান্তিক-গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চিরায়ত অধিকারকে নাকচ করছে।
- প্রস্তাবিত পানি আইনে লাইসেন্সিং-এর মাধ্যমে পানি ব্যবহার গোষ্ঠী বা সিন্ডিকেট তৈরির বিধান রাখা হয়েছে। এই লাইসেন্সের বলে জনগণের পানি ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেওয়ার রাষ্ট্রীয় অনুমোদন পাওয়া যাবে। রাষ্ট্র প্রদত্ত লাইসেন্সিং-এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগকারী বা লাইসেন্সধারীদের ব্যবসায়িক স্বার্থ বেশি বিবেচিত হবে। এতে জনগণের পানি ব্যবহারের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত বা বাণিজ্যিক স্বার্থে কুক্ষিগত হবে। প্রাকৃতিক পানির উৎসের ওপর এ ধরনের বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থি।
- প্রস্তাবিত পানি আইনে, প্রাকৃতিক পানি ব্যবহারের অধিকারের নামে জনগণের প্রাকৃতিক পানি ব্যবহারকে শুধুমাত্র 'পান, স্নান, ধোলাই ও গৃহস্থলি কর্মে' সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এটি গৃহীত হলে, প্রাকৃতিক পানির ওপর জনগণের অধিকার খর্ব হবে।
- প্রস্তাবিত পানি আইনে, পানি দূষণ ও উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পানির ধারাকে **'বাণিজ্যিক স্বার্থে আবদ্ধ'** করা আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে যথাযথভাবে বর্ণণা করা হয়নি।

খসড়া পানি আইনে - পানিকে বাণিজ্যিক পণ্য বিবেচনা করে, পানি ব্যবহার, বন্টন ও বিপণন থেকে সরকারি রাজস্ব আয়ের উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত এই খসড়া আইনে - জনগণের সাধারণ সম্পদ, জীবন ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা তথা জননিরাপত্তার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে পানিকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। প্রস্তাবিত খসড়ায়, **"পানি ব্যবহার অধিকার"** শিরোনামটি বারবার ব্যবহার করা হয়েছে - কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পানি উত্তোলন, সরবরাহ বা কোন উৎসের পানি ব্যবহারের জন্য সরকারের কাছ থেকে অনুমতি বা লাইসেন্স প্রাপ্তি বা লাইসেন্স ক্রয় করা বুঝাতে। এই কারণে অবাক হতে হয় যে, পানিকে মানবাধিকারের অংশ হিসাবে না দেখে খসড়া আইনটিতে পানিকে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।[৫]

[4] রফিকুল আলম; ইনসিডিন বাংলাদেশ, ২০০৯

[৫] ইনসিডিন বাংলাদেশ, ২০১০

এছাড়াও খসড়া আইনে আরও কিছু বহুমাত্রিক দুর্বলতা ধরা পড়ছে। যেমন-

পানি সম্পদ রক্ষা : এ পানি আইনে পানি সম্পদ রক্ষায়, বিশেষ করে পানির নিচে যে সম্পদ রয়েছে তা রক্ষা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন দিক নির্দেশনা রাখা হয়নি, এছাড়া পানি সম্পদ রক্ষা এবং তার বণ্টন ও ভোগ নীতির ক্ষেত্রেও কোন আলোচনা নেই, যা স্পষ্টতই এ আইনের বৃহত্তর পরিসরকে সীমিত করেছে

পানি নিরাপত্তা : এ আইনে পানি নিরাপত্তার বিষয়টি কোথাও আলোচনায় আসেনি, যা একধরনের ভবিষ্যৎ ভাবনা কিংবা দূরদর্শিতার ঘাটতি হিসেবে বিবেচনায় আসছে

পানি নির্ভর জনগোষ্ঠী : পানি-নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে জেলে সম্প্রদায় ও জলমহাল এবং হাওড়, বাঁওড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎসের সাথে জড়িত বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, আইনে তেমন কিছুই উল্লেখ নেই

এ আইনে লাইসেন্সসিং সর্ম্পকে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। লাইসেন্সিং বা অনুমতিদান কর্তৃত্ব যে আকারে বা অবয়বে এখানে বিবৃত হয়েছে তা কার্যত অনেক বেশি বিস্তৃত হবে বলে দৃশ্যত: প্রতীয়মান। শেষ বিচারে তা জনগণের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এমন আশংকা রয়েই যায়। লাইসেন্সিং বা অনুমতিদান কর্তৃত্ব সব সময়ই এক ধরনের ক্ষমতার বলয় তৈরি করে যা জনগণ বা ভোক্তার স্বাভাবিক এবং শ্বাশত অধিকারকে খর্ব করে। লাইসেন্সিং মূলত নামে এবং কাজে অধিকার নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং প্রস্তাবিত পানি আইনে যে, লাইসেসিং'র বিধান রাখা হয়েছে, তা জনগণের পানি ব্যবহারের সহজাত ও চিরায়ত যে অধিকার, সে অধিকার খর্ব করার, অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার এবং অধিকারকে বাণিজ্যিক মোড়কে রূপান্তর ঘটানোর মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণের পরিবর্তে কায়েমী গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের একটি সুস্পষ্ট ঝুঁকি তুলে ধরছে ।

লাইসেন্সসিং যে অর্থে এবং যে আঙ্গিকেই ব্যবহার করা হউক না কেন, এর ফলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যে কৌশল তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পানির উপর জনগণের মৌলিক ও প্রাকৃতিকভাবে অর্জিত সহজাত অধিকারকে দুর্বল করে দিবে বলেই ধারণা করা যায়।

এ ছাড়াও লাইসেন্সসিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিকীকরণের যে চেষ্টা তা সঙ্গতভাবেই বহুজাতিক ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর দেশীয় দোসররা নিয়ন্ত্রণ করবে। এতে করে রাষ্ট্রের যে মূল দায়িত্ব জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, তা পালন রাষ্ট্রের জন্য অনেক কঠিন হবে, যার ইঙ্গিত বাজার অর্থনীতির কল্যাণে, বৈশ্বিক মহামন্দার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বিশ্ববাসীর পাশাপাশি বাংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের মত অতি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দরিদ্র দেশের জনগণের পানি ব্যবহারে কোন ধরনের লাইসেন্সসিং বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, নিশ্চিত করেই জনগণের পানি ব্যবহার ও প্রাপ্তির সহজাত মৌলিক অধিকারকে খর্ব করবে ।

খসড়া পানি আইন ও কৃষি[৬]

কৃষক জনগোষ্ঠী প্রধানত দুইভাবে পানি সম্পদ ব্যবহার করে। প্রথমত: অন্য আর সবার মত তারা জীবন ধারণের জন্য পানির ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত: তারা খাদ্য ও অপরাপর কৃষি কিংবা ফসল উৎপাদনের জন্য পানি ব্যবহার করে। খসড়া আইনটি কৃষককূলের জন্য এই উভয় ক্ষেত্রেই পানি সরবরাহ করার রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাকে, অস্বীকার করেছে। "পানি ব্যবহার অধিকার" এর নামে পানির ওপর বাণিজ্যিক অধিকার প্রতিষ্ঠার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, রাষ্ট্র সুপেয় পানি সরবরাহ করার জন্য বাধ্য থাকবে না। বাজার থেকে নগদমূল্যে কৃষককে তা কিনতে হবে। একইভাবে, কৃষকগণ সেচের ক্ষেত্রেও সরকারের কাছে দাবি দাওয়া উত্থাপনের আইনি সুযোগ পাবেন না - যেহেতু এই খসড়া আইন বাজার নিয়ন্ত্রণের বিধি নয় বরং বাজারকেন্দ্রিক নীতি প্রস্তাব করছে। কৃষকের প্রয়োজন এমন একটি পানি-আইন যা রাষ্ট্রকে সুপেয় ও কৃষি-জল সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ রাখবে। সেচের জল, মৎস্য ও পশু সম্পদ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জলের সরবরাহ কৃষকের জন্য সুলভ ও সহজ করার দায়িত্ব আইনের আওতায় নিতে হবে রাষ্ট্রকেই। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ বহুদিন থেকেই রাষ্ট্রীয় পরিষেবাসমূহকে বেসরকারীকরণের যে দাওয়াই দিয়ে আসছে, খসড়া পানি আইনটি তাকে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করছে।

কৃষক স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাবিত পানি আইনে, যে সকল বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে :

- **ভূ-পৃষ্ঠের পানি:** সারফেস ওয়াটার বা ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের পানি যেমন খাল-বিল, নদী-নালার পানি ব্যবহারকে অগ্রাধিকার প্রদান, জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা অব্যাহত রাখার বিষয়ে প্রস্তাবিত এ আইনে তেমন কিছুই উল্লেখ নেই ।
- **পেশাজীবিদের ব্যবহারের অধিকার:** প্রাকৃতিক পানির উৎসসমূহে ঐতিহ্যগতভাবে সংশ্লিষ্ট (কৃষক, জেলে, মৎস্যজীবী, মাঝি, বেদে) জনগোষ্ঠীসমূহের জলসম্পদে চিরায়ত অধিকারের বিষয়টি প্রস্তাবিত এ আইনে কার্যত: নাকচ করা হয়েছে।
- **অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধ:** পানির উৎসগুলোকে অবৈধভাবে দখল করা বা বিষাক্ত বর্জ্য ফেলার মাধ্যমে বিপজ্জনকভাবে দূষিত করার মত অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে প্রস্তাবিত এ আইনটিতে যথাযথ দিক নির্দেশনা নেই। এর ফলে অবাধে শিল্প ও রাসায়নিক বর্জ্য ফেলার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পানির উৎস, ধারা ও প্রবাহ বিনষ্টের যে সাধারণ চর্চা বর্তমানে দেখা যায়, তা বন্ধে আইনগত সমাধান পাওয়া যাবে না।

[৬] ইনসিডিন বাংলাদেশ, ২০১০

বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনে পানি সম্পদ দূষণ-রোধ ও সংরক্ষণ আইনের বিধিমালা হাল নাগাদ করার পাশাপাশি যদি কৃষি নীতিতে দূষণ-মুক্ত কৃষি সম্প্রসারণের দিক নির্দেশনা না থাকে ও সেই লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগ না থাকে তবে কৃষক বেকায়দায় পরবে। তারা তাদের অজান্তেই আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। জাতীয় বাস্তবতা মাথায় রেখে, প্রাথমিকভাবে পানি দুষণকারী কৃষি প্রযুক্তি আমদানি ও উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ ও পানি তথা প্রকৃতি-বান্ধব কৃষি উপকরণকেন্দ্রিক গবেষণা, উৎপাদন, আমদানি ও ব্যবহার উৎসাহিত করার বিধি রাখা যেতে পারে।

জল-অধিকার ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নাগরিক প্রস্তাবনাঃ

আজকের বিশ্বে জল সম্পদকে বেসরকারি খাতের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়ঃ

১. সরকার কর্তৃক তার জনমানুষের জন্য গড়ে তোলা পানি সরবারহের ও পরিশোধণের পুরো অবকাঠামো ও সেবা ব্যবস্থাকে বেসরকারি খাতের হাতে তুলে দেয়া (যেমনটা ঘটেছে যুক্তরাজ্যে)।
২. বাণিজ্যিক সংস্থা/কর্পোরেশনের হাতে দীর্ঘ মেয়াদী লীজ বা ছাড় দিয়ে বেসরকারি খাতকেই কার্যত পানি সরবারহের ও পরিশোধনের সম্পূর্ণ অবকাঠামো ও সেবা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ভার এবং সেবা মূল্য সংগ্রহের দ্বায়িত্ব হস্তান্তরিত করা (যেমনটা ঘটেছে ফ্রান্সে)।
৩. রক্ষণশীল বা ধীরে চলার নীতিতে বেসরকারি খাতের সাথে একটি নির্দিষ্ট অংকের প্রশাসনিক ফি'র বিনিময়ে চুক্তিভিত্তিক জল-সেবা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ভার ছেড়ে দেয়া হয় (দক্ষিণ এশিয়ায় পরিলক্ষিত ধারা)।

বিশ্ব ব্যাংক দেশে দেশে সরকারদের বুঝাতে স্বচেষ্ট যে, সামাজিক সেবার অংশ হিসাবে না দেখে জল-বিপণনকে বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসাবে দেখতে হবে। বিশ্ব ব্যাংকের পৃষ্টপোষকতায়, বিভিন্ন পৌর এলাকায় বেসরকারি কর্পোরেশন গুলো নাগরিক পানি সরবরাহের কাঠামোয় বিনিয়োগ করতে খুবই তৎপর। কিন্তু এক হিসাব অনুযায়ী, এই কর্পোরেশনগুলো কোন বিনিয়োগ না করেই প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার সরকারি বিনিয়োগের ফায়দা লুটবে। আমাদের জাতীয় পানি নীতি প্রবর্তনের বছরেই (১৯৯৯) ভারতের চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, পুনা ও হায়দারাবাদে বেসরকারি কর্পোরেশন জল-বাণিজ্যে ঢুকে পড়েছে।[৭] অন্যদিকে, আমাদের পানিনীতি ও আইনে একই পথের প্রস্তাবনা দেখা যায়। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বেসরকারি খাতের হাতে জল পরিসেবা ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দেয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়ার সুযোগ এখনও আছে। দেখা যাচ্ছে-

১. জাতীয় ও বহুজাতিক বেসরকারি কর্পোরেশনেরা যতই দায়িত্বশীল হোক না কেন তাদের পক্ষে কখনো সবার জন্য ন্যায় সম্মত পানির হিস্যা নিশ্চিত করা সম্ভব না।
২. যেহেতু বেসরকারি কর্পোরেশনেরা "টাকার বিনিময়ে জল " সরবরাহের নীতিতে পরিচালিত হয়, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষেরা কখনই তাদের চাহিদা মোতাবেক সেবা পায় না।
৩. বেসরকারি কর্পোরেশন প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রণোদনা ও অগ্রাধিকার ধারণ করে না।
৪. যেহেতু মুনাফা বৃদ্ধিই বেসরকারি কর্পোরেশনের মূল লক্ষ্য, কাজেই তারা প্রায়শই পানি ব্যবহার বৃদ্ধির দিকেই জোর দেয়। এর ফলে জল-সম্পদ সংরক্ষণের নীতি বাস্তবায়ন প্রশ্ন বিদ্ধ হয়।[৮]

আমরা ক্রমাগত দেখছি যে, জল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা সরবরাহের নীতি, আইন ও পরিকল্পনায় জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছে, জনমানুষের এ প্রসঙ্গে অংশগ্রহণের সুযোগ কমে যাচ্ছে অথচ বেড়েই চলেছে কর্পোরেশন আর আন্তর্জাতিক দাতাদের দৌরাত্ম্য। এর পিছনে কাজ করছে এক বিশাল ব্যবসায়িক স্বার্থ ও বাজার সম্ভাবনা। এক হিসাব আনুসারে, প্রতি ২০ বছরে পানির চাহিদা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে, ২০২৫ সালে পানির চাহিদা বিশ্বের মোট পানির সরবরাহের চেয়ে প্রায় ৫৬ শতাংশ বেশি হয়ে যাবে।[৯] এই বাজার সমীকরণ, পানিকে কেবল জাতীয় পর্যায়ে পণ্যে রূপান্তরিত করছে না - জল পরিচলন ও ব্যবস্থাপনা সেবা হয়ে ওঠছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অংশ। এ কারণেই, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গ্যাটস চুক্তি (সেবা খাতের সাধারণ চুক্তি) একটি দেশকে তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বহুজাতিক কর্পোরেশনের পক্ষে অন্য সদস্য রাষ্ট্রের সেবা খাত সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও উদ্যোগকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার দেয়। এর ফলে কোন একটি রাষ্ট্রের জাতীয় জল-ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক জল-বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব এবং তা ভেঙ্গে ফেলার জন্য চাপ প্রয়োগ করাও যেতে পারে। গ্যাটস'এর আওতায় রাষ্ট্রসমূহকে তার রাষ্ট্রীয় সেবা কাঠামো সমুহকে (যেমন, জল সরবরাহ ও পরিশোধন ইত্যাদি) বজায় রাখতে হলে "প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা"র ***(necessity test)*** মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে, রষ্ট্রীয় পরিষেবা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।[১০] কাজেই পানি নীতি ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সব চাপ ও সম্ভাব্য বাণিজ্যিক আগ্রাসনের মুখে জনগণের পানির অধিকার সুরক্ষার যথাযথ প্রতিবিধান খুঁজতে হবে।

---

[৭] **Water Privatisation And Water Wars, July 14, 2005 By Vandana Shiva & Ann Ninan; India Resource Center; April 16, 2003**

[৮] ***Source: Global water grab: Polaris Institute***

[৯] ***Global water grab: Polaris Institute***

[১০] ***Global water grab: Polaris Institute***

এই প্রেক্ষাপটে, খসড়া পানি আইনটি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো গুরুত্বের দাবিদার-

প্রথমত: পানিকে বাণিজ্যিক পণ্য ও রাজস্ব আয়ের উপকরণ হিসেবে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে জননিরাপত্তা ও জনস্বার্থের জন্য প্রয়োজনীর সম্পদ হিসাবে পানিকে আইনী স্বীকৃতি দেয়া জরুরী। এই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ খসড়াটি মূল্যায়ন ও পরিমার্জন ছাড়া আইনটি হয়ে উঠবে কৃষক স্বার্থ তথা জনস্বার্থ বিরোধী। প্রস্তাবিত পানি আইনের বাণিজ্যমুখী নির্দেশনা তথা লাইসেন্সিং ব্যবস্থা থেকে সরে এসে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও তদারকি জোরদার করার বিধি প্রবর্তন জরুরী।

দ্বিতীয়ত: সাধারণত মানুষের সুপেয় পানি ও কৃষকের কৃষি কাজে ব্যবহৃত পানিকে "অগ্রাধিকার খাত" গণ্য করে তার সরবরাহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া জননিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অসম্ভব।

তৃতীয়ত: কৃষি নীতি, মৎস্য নীতি, পশু সম্পদ নীতি, বানিজ্য নীতি (বিশেষত সেবা বাণিজ্য নীতি) ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনার সাথে পানি আইনের সমন্বয় জরুরী। এই সমন্বয় সাধন করতে জনমানুষের সাথে সরাসরি মত বিনিময় করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত পানি আইন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীসমূহের মতামত অন্তর্ভূক্ত করতে জাতীয়ভিত্তিক পরামর্শ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এছাড়া, জনগণের নিরাপদ পানি প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকল্পে দুষণ ও আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা বিধানকারী বিধিমালা অন্তর্ভূক্ত করা জরুরি। একই সাথে আর্সেনিক বা অন্য প্রকার পানি দূষণজনিত ক্ষতির শিকার ব্যক্তিদের ও ফসলের জন্য আইনগত সুরক্ষা বিধিমালা অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে কৃষির স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ও খাদ্যনিরাপত্তার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কৃষি ও সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় বিধিমালা অন্তর্ভূক্তকরণ প্রয়োজন।